রবের পথে যাত্রা

বই : রবের পথে যাত্রা
লেখক : মুহাম্মাদ শাকিল হোসাইন
প্রকাশনায় : রাইয়ান প্রকাশন

রবের পথে যাত্রা

মুহাম্মাদ শাকিল হোসাইন

রাইয়ান প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ

অক্টোবর ২০২২

© গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত

ইমেইল

raiyaanprokashon@gmail.com

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মার্জিন সলিউশন, ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মোবাইল : ০১৮১০০৪৭৭৬৩

প্রচ্ছদ

আহমাদুল্লাহ ইকরাম

অঙ্গসজ্জা

সাবেত চৌধুরী

মুদ্রিত মূল্য

১৮৫/- টাকা

ROB ER POTHE JATRA

Published By: Raiyaan Prokashon

© গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত। লেখক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশের প্রতিলিপিকরণ, পুনর্মুদ্রণ, ফটোকপি, স্ক্যা ন, পিডিএফ প্রস্তুতকরণ, অন্য কোনো বই, ম্যাগাজিন, পত্রিকায় প্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে দা'য়াহর স্বার্থে গ্রন্থের কোনো অংশ ব্যবহার করতে চাইলে উদ্ধৃতি ব্যবহার করা জরুরি। উপরোক্ত শর্তাবলীর লঙ্ঘন শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে অবৈধ।

সূচিপত্র

অবলম্বনকারীর কথা ৭

প্রবেশিকা ১০

প্রথম পদক্ষেপ : তাওবা ও আশা ২২

দ্বিতীয় পদক্ষেপ : আল্লাহর সুন্নাতের খেয়াল রাখা ২৯

তৃতীয় পদক্ষেপ : তাওয়াক্কুল ৩৩

চতুর্থ পদক্ষেপ : ইখলাস..... ৩৬

পঞ্চম পদক্ষেপ : তাফাক্কুর ৪০

ষষ্ঠ পদক্ষেপ : আগে পরিশুদ্ধি, তারপর সাজসজ্জা.....৪৫

সপ্তম পদক্ষেপ : সময় ব্যবস্থাপনা ৪৯

অষ্টম পদক্ষেপ : পরীক্ষার সময় সবর.....৫১

নবম পদক্ষেপ : প্রারম্ভকে দীপ্তিময় করা.....৫৭

দশম পদক্ষেপ : নিজের ত্রুটি আবিষ্কার..... ৬০

একাদশ পদক্ষেপ : আত্ম-সমালোচনা.....৬৪

দ্বাদশ পদক্ষেপ : সৎ বন্ধু ৬৮

ত্রয়োদশ পদক্ষেপ : উদাসীনতা..... ৭১

চতুর্দশ পদক্ষেপ : অপমান, মুখাপেক্ষীতা ও ধোঁকা থেকে মুক্ত হওয়া ৭৬

পঞ্চদশ পদক্ষেপ : কৃতজ্ঞতাবোধ.....৭৮

ষষ্ঠদশ পদক্ষেপ : আল্লাহর ‘দান করা’ ও ‘বঞ্চিত করা’র প্রজ্ঞা বোঝা.....৮২

সপ্তদশ পদক্ষেপ : আল্লাহর সাহচর্য উপভোগ ও তাঁর নিকট দুআ ৮৭
অষ্টাদশ পদক্ষেপ : ইবাদাতের মানোন্নয়ন ৮৯
উনবিংশ পদক্ষেপ : দুর্বলতার আহ্বান ৯৪
বিংশ পদক্ষেপ : ইয়াকীন ও যুহদ ৯৭
একবিংশ পদক্ষেপ : প্রশংসার মোকাবেলা..... ১০১
দ্বাবিংশ পদক্ষেপ : ভুলকারীর সাথে রহমত প্রদর্শন.....১০৪
ত্রিবিংশ পদক্ষেপ : অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ সম্পাদন ১০৭
চতুর্বিংশ পদক্ষেপ : সন্তুষ্টি ১১০
পঞ্চবিংশ পদক্ষেপ : বিনয় ১১২
ষষ্ঠবিংশ পদক্ষেপ : আশির্বাদপুষ্ট জীবন.....১১৪
উপসংহার : সমাপ্তি নয়, নিরন্তর পথচলা ১২২

প্রকাশকের কথা

প্রশংসা মাত্রই মহান আল্লাহর জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের রাসূল, চোখের শীতলতা, উম্মতের পথের দিশারী-দরদী নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এবং তার পরিবার পরিজন ও সাহাবীদের উপর।

হামদ ও সালাতের পর সমাচার হল, আত্মশুদ্ধি ইসলামের অন্যতম মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। আত্মশুদ্ধি মানে চিন্তাকে বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাসের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ করা, অন্তর থেকে আল্লাহ ব্যতীত যাবতীয় ইলাহকে পরিত্যাগ করা। সকলপ্রকার নেতিবাচক গুণ থেকে পবিত্র করে উত্তম গুণাবলী দিয়ে সাজানো, গোটা মানবসত্তাকে ঐশী মূলনীতির মাধ্যমে পুনর্গঠিত করা।

লেখকের অবলম্বনকৃত এ বইতে আল্লাহর নৈকট্য লাভের কিছু মূলনীতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বইটির আদ্যোপান্ত পড়েছি, আসলে এটি এক ধরণের প্রস্থান। অন্ধকার থেকে আলোর যাত্রা। এই যাত্রা কেবল আল্লাহর পথে, সত্যের প্রশস্ত রাস্তা হয়ে তাঁর নিকট পৌঁছার অনবদ্য এক সফর।

আল্লাহ প্রেমে মতোয়ারা হয়ে বুঁদ হওয়া, গুণাহের নাপাক শরাব থেকে শরাবান তাহুরা পানে ধন্য হতে চাওয়া প্রতিটি ব্যাকুল-অস্থির মন, পাপী-তাপী মন তাওবা করত সদ্য জন্মানো শিশুর মত মাসুম-নিষ্পাপ হবে কীভাবে? বইটিতে সে বিষয়গুলোই কুরআন হাদিসের আলোকে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ বইটি পড়ে যদি একজন পাঠকও হেদায়েতের ঊষাসিনিগ্ধ আলোকিত পথের দিশা পায়; তাহলে আমাদের প্রচেষ্টা সফল হবে। বইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে জানাই শুকরিয়া। আল্লাহ তাআলা এই বইকে হেদায়েত ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যম হিসেবে কবুল করুন। সবধরণের পাঠকের বোধগম্য করুন। খাইর ও আফিয়াতের সাথে এর বারাকাহ সবার মাঝে ব্যপৃত করুন। আমিন।

প্রকাশক
রাইয়ান প্রকাশন

অবলম্বনকারীর কথা

আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের রাসূল, পথপ্রদর্শক মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহর ওপর। আত্মশুদ্ধি ইসলামের মৌলিক লক্ষ্যের একটি। আত্মশুদ্ধি মানে চিন্তাকে সঠিক আকীদা-বিশ্বাসের মাধ্যমে বিশুদ্ধ করা, অন্তরকে সকলপ্রকার নেতিবাচক গুণ থেকে পবিত্র করে উত্তম গুণাবলী দিয়ে সাজানো, গোটা মানবসত্তাকে ঐশী মূলনীতির মাধ্যমে পুনর্গঠিত করা।

আত্মশুদ্ধি বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ ধ্রুপদী সময় থেকেই লেখা হয়ে আসছে। অগণিত আলিম এ বিষয়ে কলম ধরেছেন। এসকল আলিমদের মাঝে একটি উজ্জ্বল নাম ইবনু আতাঈল্লাহ আল-ইসকান্দারী রাহিমাহুল্লাহ। মিশরে জন্মা এই আলিম ছিলেন সূফিবাদ ও ফিকহ, শরীয়ত ও হাকীকতের বিদগ্ধ পণ্ডিত। তাঁর হাত থেকে আত্মশুদ্ধি বিষয়ে অসংখ্য লেখা উৎসরিত হয়েছে। তাঁরই মধ্যে একটি রত্ন হচ্ছে 'আল-হিকাম'। আকারে ছোট এ বইটি কিছু প্রজ্ঞাগর্ভ বচনের সমষ্টি।

এমনিতে একে কথামালা বা কথাসাগর মনে হলেও আদতে এতে আল্লাহর পথের পথিকদের জন্য মূল্যবান কিছু দিকনির্দেশনা আছে, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে যা ধরা পড়ে। আল-হিকাম থেকে সেসকল দিকনির্দেশনা নিয়েই ড. জাসের আউদা সাহেব 'আস-সুলূক মাআল্লাহ রিহলাতুন মাআ হিকাম ইবনু আতাঈল্লাহ ইসকান্দারী ফি দুইল কুরআনি ওয়াস সুন্নাতি ওয়াস সুনানিল ইলাহিয়্যাহ' বইটি রচনা করেছেন। বক্ষমান গ্রন্থটি সেই মূল আরবী বইটির কাঠামো অনুসরণ করেই লেখা। কিছু বিষয়ে লেখকের মতের সাথে মতের দ্বৈততা পরিলক্ষিত হয়েছে বলে তা বাদ দেওয়া হয়েছে, আবার কোথাও আরও বিস্তৃত করে বলা হয়েছে, আবার অনেক স্থানেই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি সংযোজিত হয়েছে। তাই একে সরাসরি অনুবাদ বলা যায় না, আবার পরিপূর্ণ নিজস্ব ও স্বতন্ত্র রচনাও বলা যায় না, এ দুইয়ের মাঝামাঝি, অনেকটা অবলম্বন বলা চলে হয়ত-বা। আরেকটি কথা বলে রাখা দরকার যে, লেখকের একটি বইয়ের বিষয়বস্তু অবলম্বন করা মানে সামগ্রিকভাবে লেখকের যাবতীয় বিষয়বস্তুর সাথে একাত্মতা পোষণ করা নয়। এ কারণে আমরা এর মাধ্যমে মূল লেখককে প্রোমোট করছি–এমনটা যাতে কেউ না ভাবেন।

কোথাও কোথাও বোঝার সুবিধার্থে ও সন্দেহ নিরসনে অল্প কিছু পাদটীকা যোগ করে দিয়েছি, আশা করি এতে পাঠকবৃন্দ উপকৃত হবেন। পরিশেষে আল্লাহর কাছে কবুলিয়্যাতের এবং অবলম্বনকারী, প্রকাশকসহ এর সাথে জড়িত প্রত্যেকের জন্য যেন তা নাজাতের কারণ হয় সেই দুআ করছি, আমীন।

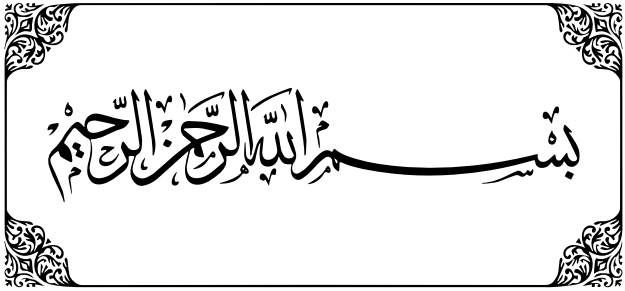
بسم الله الرحمن الرحيم

প্রবেশিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য; যা পবিত্র ও বারাকাহসমৃদ্ধ; যেমনটা তিনি ভালোবাসেন ও সন্তুষ্ট হন; যেমনটা তাঁর মহত্ত্ব ও বিরাট সাম্রাজ্যের দাবীদার। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বময় সৌভাগ্যের অধিকারী, সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের ওপর এবং তাদের ওপরও যারা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাঁর আনীত হেদায়াত অনুসরণ করবে।

প্রারম্ভেই আমরা আল্লাহর অফুরন্ত রহমত ও নিআমতের ভাণ্ডার থেকে দয়া ও ঐশ্বর্য কামনা করছি। আল্লাহ যেন আমাদের জন্য তাঁর রহমত, ঔদার্য ও আশির্বাদের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন–আর তা এজন্য নয় যা আমরা করেছি বা যা আমরা জানি। তিনি জানেন, তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী, মহাপবিত্র বহু উর্ধ্বের সেই সত্তা। আর আমরা এটাও জানি না আগামী দিন আমাদের সাথে কী ঘটতে যাচ্ছে। সকল শক্তি কেবল তাঁরই, আমাদের কোনো শক্তি-সামর্থ্য নেই। তিনি সকল কিছুর ওপর শক্তিমান।

তিনি যেন আমাদের জন্য কল্যাণকে সহজতর করে দেন, তা যেখানেই থাকুক না কেন। আমরা তাঁর নিকটই আমাদের সকল বিষয়াদি সমর্পণ করছি। আমরা কামনা করি তিনি যেন আমাদেরকে ধোঁকা ও অজ্ঞানতা থেকে রক্ষা করেন। আমাদের পাপগুলোকে ঢেকে রাখেন এবং এমন কথা বলার ও এমন কাজ করার সামর্থ্য দেন যা তিনি পছন্দ করেন ও যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন। আমাদের এই যাত্রার মাধ্যমে আমরা যাতে নিজেদেরকে সত্যিকারার্থেই পরিবর্তন করতে সক্ষম হই।

নিজেকে পরিবর্তন করা, কল্যাণের অনুশীলন করা কিংবা মহাসত্যের পথে উন্নতি লাভ করা–এর কোনোটিই আল্লাহর তাওফীক ও করুণা ছাড়া সম্ভব নয়। আল্লাহ বলছেন,

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ.

> "আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না, তবে আল্লাহ তা'আলাই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন।"[১]

[১] সূরা কাসাস, ২৮: ৫৬

তবে আল্লাহর এই জগত যেমন সুশৃঙ্খল ও সামঞ্জস্যপূর্ণ, তেমনি তাঁর কাজও সুষ্ঠু ও সঙ্গতিপূর্ণ। তিনি কোনো কাজই এবড়ো-থেবড়োভাবে সম্পাদন করেন না। নিয়ম ও মূলনীতি ব্যতিরেকে ছন্দছাড়া কোনো কর্মই তিনি করেন না। কোনো প্রকার প্রজ্ঞা বা উদ্দেশ্য ছাড়া কাজ করা থেকে তিনি বহু উর্ধ্বে। জগত পরিচালনার জন্য তিনি কিছু নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করে রেখেছেন। এগুলোকে বলা হয় সুন্নাতুল্লাহ বা আল্লাহর রীতি। এই সুন্নাত অনুযায়ীই যাবতীয় সকল কিছু সম্পাদিত হচ্ছে।

তিনি কাউকেই বিনাশ্রমে হেদায়াতের পথে পূর্ণাঙ্গতা দান করেন না। আবার কাউকেই জোর করে পথভ্রষ্ট করেন না। পৃথিবী পরিচালনার মত হেদায়াত ও পথভ্রষ্টতার ক্ষেত্রেও তাঁর নির্দিষ্ট কিছু সুন্নাত বা রীতি আছে।[১] যে হেদায়াতের জন্য উন্মুখ থাকে, নিজের অন্তরকে জেদ, হঠকারিতা, পূর্বপুরুষের অনর্থক রীতিনীতিসহ সমাজ-সভ্যতার নানাবিধ নিয়মশৃঙ্খলের অন্ধ অনুকরণ থেকে মুক্ত রাখতে পারবে–তার জন্য হেদায়াতের দরজা উন্মুক্ত থাকবে। তার জন্য সত্য বোঝা সহজ হবে, সত্যের পথে প্রগতি করা আসান হয়ে যাবে। আর যে এসব গুণ অর্জন করতে ব্যর্থ হবে, সে হেদায়াত পাবে না, আর পেলেও হয়ত তা ধরে রাখতে সক্ষম হবে না।

আল্লাহ তাঁর সুন্নাত মোতাবেক আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি কখনোই সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন না। আমরা কৃতজ্ঞ হলে তিনি বাড়িয়ে দেন, ক্ষমাপ্রার্থনা করলে রিযক দেন, বিনয় ও আকুলতার সাথে দুআ করা হলে তিনি সাড়া দেন। আমরা চাইলে তিনি আমাদেরকে দান করেন–এসব কিছুই তাঁর ওয়াদা, তাঁরই প্রতিশ্রুতি। আর তাঁর এই দান কেবল জাগতিক বিষয়বস্তুর মাঝেই সীমাবদ্ধ নয় বরং তা বস্তুগত, আধ্যাত্মিক, আত্মিক, ইহজাগতিক এবং পরকালীন জগত পর্যন্ত বিস্তৃত। সকল ধরণ ও প্রকারের রিযক এর মাঝে শামিল রয়েছে। আর এ সবকিছুই মূলত তাওয়াক্কুল, দুআ, আল্লাহর প্রতি বিনয় মিশ্রিত প্রত্যাবর্তনের ফল।

আমরা এ বইতে আল্লাহর নৈকট্য লাভের কিছু মূলনীতি নিয়ে আলোচনা করবো। আসলে এটি এক ধরণের যাত্রা। আল্লাহর পথে যাত্রা। সত্যের প্রশস্ত রাস্তা হয়ে তাঁর নিকট পৌঁছার অনবদ্য ভ্রমণ। যদিও তিনি আমাদের নিকটবর্তী, আর কেনই-বা হবে না? তিনি নিজেই বলেছেন এ কথা,

[১] বিস্তারিত জানতে শায়খ ড. আব্দুল করীম যাইদানের 'সুনানুল ইলাহিয়া' গ্রন্থের ৩৫-৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ.

"আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী।"[১]

কিন্তু আমরা নিজেদের অযোগ্যতা, পাপাচার ও অন্যায়ের কারণে তাঁকে নিকটবর্তী বলে মনে করতে পারি না। নিজেদের ত্রুটি বিচ্যুতির কারণেই আমরা তাঁর নৈকট্যকে অনুভব করতে পারি না। পারি না তাঁকে নিসন্দিগ্ধ বাস্তবতা বলে মনে করতে। এ কারণে আমরাই প্রকৃতপক্ষে তাঁর থেকে দূরে। আমরাই দূরবর্তী। এ কারণে আমাদের জানা প্রয়োজন নিজেদের দুর্বলতার মূর্তপ্রতীক এই দূরত্বকে কীভাবে ঘুচিয়ে আমরা তাঁর নিকটবর্তী হতে পারি।

এখানে আমরা নানা ধরণের শিষ্টাচার শিখবো। সেই শিষ্টাচার মানুষের সাথে পালন করার জন্য নয়, বরং আল্লাহর সাথে পালনীয় শিষ্টাচার। আমরা জানবো আচার-ব্যবহারের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে। তবে মানুষের সাথে আচার-ব্যবহারের নয়, বরং আল্লাহর সাথে আচার-ব্যবহারের। যেই আচারাদি তাঁর সুন্দরতম নাম ও গুণাবলীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও উপযোগী হবে। ইসলামে এরূপ জ্ঞানের প্রভূত গুরুত্ব রয়েছে। তবুও অনেক সময় আমরা তা ভুলে যাই, এর প্রকৃত গুরুত্ব দেই না। এ কারণে নিজেদেরকে সর্বদা এর ব্যাপারে স্মরণ করিয়ে দেওয়া আমাদের অতি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য।

আমরা এখানে ইসলামের বাহ্যিক আচারাদি কিংবা বিধিবিধান নিয়ে আলোচনা করবো না। কোন কাজ হারাম আর কোনটা অপছন্দনীয় আর কোনটা হালাল; কীভাবে শরীয়তের আহকামের ওপর আমল করতে হয়, কখন কোন কাজ করতে হয়, কীভাবে তা যথাযথভাবে পালন করতে হয়–এসব নিয়ে আমরা আলোকপাত করবো না। আমরা এ বইতে দেখবোঃ আল্লাহর সাথে কীভাবে শিষ্টাচারের সাথে আচরণ করতে হয়? কীভাবে তাওবা করতে হয়? কীভাবে আল্লাহর ওপর প্রকৃতার্থেই ভরসা করতে হয়? একনিষ্ঠতার সাথে নিজের সকল বিষয়াদি তাঁর কাছে কীভাবে সঁপে দিতে হয়? কীভাবে তাফাক্কুর করতে হয়? কীভাবে তাঁর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্টচিত্ত হতে হয়? কিভাবে তাঁকে ভয় পেতে হয়? কীভাবে নিজেকে তাঁর নিকট বিনীত করতে হয়? দুর্বল ও পাপাচারী বান্দারা কীভাবে সেই মহান সত্তার নিকটবর্তী হতে পারে? অর্থাৎ,

[১] সূরা ক্বফ, ৫০:১৬

নিজেকে কীভাবে সে সামগ্রিকভাবে পরিশুদ্ধ করতে পারে? কেননা, কিয়ামতের দিন অন্তরের পরিশুদ্ধি ছাড়া আর কিছুই কাজে আসবে না।

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ. إِلَّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ.

"যে দিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো উপকারে আসবে না; কিন্তু যে সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে সে ব্যতিরেকে।"[১]

কারণ, এই পরিশুদ্ধির ওপরই নির্ভর করছে অনন্তকালের জীবনের সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা।

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا.

"যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সে-ই সফলকাম হয় এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়।"[২]

এই পরিশুদ্ধিকে আরবীতে বলা হয় তাযকিয়া। এর আভিধানিক অর্থ প্রবৃদ্ধি (growth)। প্রবৃদ্ধির উত্তম নিদর্শন গাছ। একটি বীজ উপযুক্ত পরিবেশ পেলে বড় হতে হতে এক সময় বিরাট বৃক্ষে রূপান্তরিত হয়। একই ব্যাপার মানুষের তাযকিয়ার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মানুষের মাঝে পবিত্র ফিতরাতরূপী বীজ সঠিক পরিবেশ পেলে পবিত্রতার এক বটবৃক্ষে পরিণত হয়। তখনই মানুষ সক্ষম হয় অভ্যন্তরীণ আগাছারূপ কলুষতা থেকে মুক্ত হয়ে সঠিক বিশ্বাস, যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গি, উত্তম আচরণের মাধ্যমে নিজেকে সত্য ও সুন্দরের পথে উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। এ কারণে তাযকিয়াকে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক-আত্মিক-আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধি, বিকাশ ও প্রবৃদ্ধি (intellectual or spiritual development) হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে।[৩]

---

[১] সূরা শুআরা, ২৬:৮৮-৮৯

[২] সূরা শামস, ৯১:১০

[৩] "মোট কথা, 'তাযকিয়াতুন নাফস' বলতে আকীদা-বিশ্বাস, আমাল-আখলাক, স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার, লেনদেন ও কৃষ্টি-সংস্কৃতি ইত্যাদি সবকিছুই পরিশুদ্ধকরণকে বোঝায়। উল্লেখ্য যে, ইসলাম একটি স্বভাবগত ও বাস্তবসম্মত জীবনব্যবস্থা হিসেবে মানুষের জৈবিক চাহিদাসমূহকে

মানুষের মাঝে নানাপ্রকার প্রতিভা ও সম্ভাবনার (potentials) বীজ লুক্কায়িত ও প্রোথিত রয়েছে। তাযকিয়া মানুষের সেসকল প্রতিভা ও সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপান্তর করার নাম। এ কারণে তাযকিয়াকে 'ঐশী মূলনীতির মাধ্যমে মানবীয় ব্যক্তিত্বের বিনির্মাণ' বলেও অভিহিত করা যেতে পারে।

ইসলামী পরিভাষায় আত্মার পরিশুদ্ধি সংক্রান্ত জ্ঞানকে 'ইলমুত তাযকিয়া' বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। কেউ কেউ আবার একে 'ইলমুত তাসাওউফ', 'ইলমুল খুশু', 'ইলমুস সুলুক'সহ নানা পরিভাষায় আখ্যায়িত করেছেন। প্রশ্ন আসতে পারে, তাযকিয়া নামে পৃথক কোনো জ্ঞানশাস্ত্রের প্রয়োজন কেন পড়লো? আসলে জ্ঞানের যেকোনো শাখাই মানুষের প্রয়োজনের ভিত্তিতে পত্তন করা হয়ে থাকে, এমনকি শরীয়তের ইলমও। যেমন–ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইলমুত তাফসীর, ইলমুল ফিকহ, ইলমুল হাদীছ বা আসমাউর রিজাল নামে জ্ঞানের পৃথক পৃথক কোনো শাখা ছিলো না। উসূল, দাওয়াহ, কালাম এসকল বিষয় নিয়ে জ্ঞানের স্বতন্ত্র কোনো শাখা বিদ্যমান ছিলো না। পরবর্তীতে সময়ের বিবর্তনে এসকল বিষয়ে আলাদা শাস্ত্র করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলো, যাতে মানুষ তা শিখতে এবং পরবর্তী প্রজন্মকে শেখাতে সক্ষম হয়।[১]

অস্বীকার করে না এবং এগুলো পূরণের জন্য চেষ্টা ত্যাগ করতেও বলে না। বরং ইসলামের নির্দেশ হলো–মানুষ তাঁর স্বভাবগত জৈবিক চাহিদাগুলো পূরণ করবে এবং এ জন্য চেষ্টাও চালাবে। তবে তাকে এ ক্ষেত্রে নাফসের ওপর সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রণ ও শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাকে তার চাহিদাগুলো পূরণের ক্ষেত্রে ন্যায়-অন্যায় ও হালাল-হারাম বাছ-বিচার করতে হবে, অন্যের অধিকার, প্রয়োজন ও স্বার্থের প্রতি পূর্ণ মাত্রায় লক্ষ্য রাখতে হবে। এরূপ কর্ম অনুশীলনের ফলে ক্রমে নাফসের পশুত্বসুলভ ভাব ও চরিত্র (যেমন–লোভ-লালসা, আত্মপ্রীতি, হিংসা-বিদ্বেষ, গর্ব-অহঙ্কার, অবাধ যৌনাচার, ধন-সম্পদ ও নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের প্রতি প্রবল মোহ প্রভৃতি) দুর্বল ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে, পক্ষান্তরে তার বিবেক-বোধ ও সুকুমার বৃত্তি (যেমন- সততা, নিষ্ঠা, ধৈর্য্য, ক্ষমা, মহানুভবতা, বিনয় ও নম্রতা প্রভৃতি) জাগ্রত ও সবল হয়। ফলে ক্রমে তার মনুষ্যসুলভ ভাব ও নৈতিক মূল্যবোধ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও বিকশিত হয়। এভাবে মন্দকর্মপ্রবণ নাফস (নাফস আম্মারাহ) পর্যায়ক্রমে লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ ও গর্ব-অহঙ্কার প্রভৃতি অশিষ্ট প্রবণতা থেকে পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র হয় এবং তা ক্রমে সুকর্মপ্রবণ প্রশান্ত নাফসে (নাফসে মুতমায়িন্নাহ) রূপান্তরিত হয়।" ড. আহমদ আলী, তাযকিয়াতুন নাফস, পৃঃ ২৪-২৫

[১] "আত্মশুদ্ধি ও চারিত্রিক সৌন্দর্যের (তাযকিয়ায়ে নফস ও তাহযিবে আখলাক) প্রশস্ত ও শক্তিশালী নীতি, যা পরবর্তীকালে একটি স্বতন্ত্র বিদ্যা ও বিষয়ের রূপ পরিগ্রহ করেছে। কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানের

একই কথা ইলমুত তাসাওউফের ক্ষেত্রেও সত্য। আপনি চাইলে একে তাসাওউফ না বলে অন্য কিছু বলতে পারেন। পারিভাষিক দিক থেকে ভিন্ন হলেও এদের অর্থ আসলে একই–মানুষের ব্যক্তিত্ব ও আত্মার পরিশুদ্ধি বিনির্মাণ, অভ্যন্তরজগতকে আলোকিত করা, নিজের উপলব্ধির জগতকে ন্যায় ও পুণ্য দিয়ে সজ্জিত করা, আচার-আচরণকে উত্তম গুণাগুণ দিয়ে অলঙ্কৃত করা। যতক্ষণ পর্যন্ত এই অর্থ ঠিক থাকবে, ততক্ষণ আপনি একে তাসাওউফ, সুলুকসহ যা বলতে চান বলুন, কোনো সমস্যা নেই ইন শা আল্লাহ। কেননা আমাদের কাছে পরিভাষা নয়; বরং পরিভাষার মাঝে সুপ্ত মূল অর্থই বিবেচ্য। যতক্ষণ পর্যন্ত অর্থ ও উদ্দিষ্ট ঠিক থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত পরিভাষা নিয়ে অধিক মাতামাতি করার কিছু আছে বলে আমরা মনে করি না।[১]

প্রতারণা চিহ্নিতকরণ, চারিত্রিক ব্যাধির প্রতিষেধক, আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন, গোপন সম্পর্ক অর্জন করার উপায়, পথের ব্যাখ্যা ও বিন্যাস–যার প্রকৃত ভিত্তি তাযকিয়া ও ইহসানের নমুনা ও ধর্মীয় ব্যবহার–প্রথম থেকেই বিদ্যমান ছিলো। পরবর্তী শতাব্দীতে তা পরিভাষা ও প্রচলনে তাসাওউফ নামে খ্যাত হয়েছে। ...ধীরে ধীরে এ বিষয়ের পণ্ডিত ব্যক্তিরা বিষয়টি ইজতিহাদের স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন এবং দীনের বিরাট খেদমত সমকালীন জিহাদ হিসেবে স্থির করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা এর ফলে মৃত হৃদয় জীবিত করেছেন এবং আত্মার ব্যাধি দূর করেছেন।" মাওলানা আবুল হাসান আলী নদবী, তাযকিয়া ও ইহসান, পৃঃ ২৬

[১] "তাই উদার চিত্তে আমাদের এর হাকিকত স্বীকার করতে হবে। এসব বিধান ও পরিভাষা, ইচ্ছা ও পক্ষপাতিত্ব থেকে অবমুক্ত হয়ে চিন্তা করতে হবে। এমন যেন না হয় যে, আমরা একটি ধর্মীয় হাকিকত বা মূলতত্ত্ব–শরীয়তের স্বীকৃত বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত এবং কুরআন-সুন্নাহ এর প্রতি আহ্বান করছে, মানবিক জীবনধারায় এর অত্যন্ত প্রয়োজন রয়েছে–থেকে নিছক একটি নতুন পরিভাষা এবং প্রচলিত নামের দরুন পশ্চাদপসরণ করতে লেগে গেলাম।" মাওলানা আবুল হাসান আলী নদবী, তাযকিয়া ও ইহসান, পৃঃ ১৫

"তাদের মূল দৃষ্টি মূলতত্ত্ব ও অর্থের প্রতি নয় বরং বাহ্যিক শব্দাবলীর প্রতি দৃষ্টি রেখেই তারা এ জাতীয় মন্তব্য করে থাকেন। কারণ, তারা যখন তাসাওউফের ভিত্তি কুরআন-হাদীসে দেখতে চান, তখন তারা 'তাসাওউফ' শব্দ বা 'পীর-মুরীদী' শব্দসমূহ সন্ধান করতে থাকেন। আর কুরআন-হাদীসে এসব শব্দ না পেয়ে তারা তাসাওউফকে বিদআত ও গোমরাহী বলে আখ্যায়িত করেন। অথচ একথা সুস্পষ্ট যে, এগুলো শুধু পারিভাষিক শব্দ। এগুলোর মূলতত্ত্ব ও অর্থ যদি কুরআন-হাদীসে বিদ্যমান থাকে, তাহলে শুধু এসব শব্দ বিদ্যমান না থাকায় কোন অসুবিধা নেই।" মাওলানা আবদুল মালেক, তাসাওউফ তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ, পৃঃ ৫৩

প্রত্যেক শাস্ত্রের মাঝেই ভুলশুদ্ধের ব্যাপার আছে। তাসাওউফের ক্ষেত্রেও কোনো কোনো ব্যক্তি থেকে বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা ও কর্মকাণ্ডের নিদর্শন আছে, তাসাওউফশাস্ত্রেও এর বহু প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু এর দ্বারা স্বয়ং তাসাওউফ বা তাযকিয়া শাস্ত্র মন্দ হয়ে যায় না। ফিকহ, উসূল, দাওয়াহ সকল ক্ষেত্রেই আলিমদের ভুল হতে পারে, কেউ কেউ বিভ্রান্তিও ছড়াতে পারে, আর ভুল হয়েছেও। এর দ্বারা এসকল শাস্ত্রের গুরুত্ব ও তাৎপর্য লঘু হয়ে যায় না। দোষ ভুলকারীর, মূলশাস্ত্রের নয়।[১]

তাসাওউফশাস্ত্রের কিছু ব্যক্তি তাওয়াক্কুলের ভুল অর্থ বের করেছেন, আল্লাহর প্রতি আশার ভুল মর্ম বুঝেছেন, দুনিয়াকে পুরোপুরি পরিত্যাগের তত্ত্ব বের করেছেন– এগুলো সবই ভুল ও ভ্রান্তি। কিন্তু এর দ্বারা স্বয়ং তাসাওউফশাস্ত্র কলুষিত হয়ে যায়নি, যেতে পারে না। কিছু ব্যক্তির গলদের কারণে গোটা শাস্ত্র–যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ– পরিত্যাগ করা নিছক বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়।

তাসাওউফ নিয়ে একদলের ভুল বোঝাবুঝির অনেক কারণ আছে। তার মধ্যে কেন্দ্রীয় কারণ হচ্ছে তাসাওউফের প্রকৃত স্থান ও অবস্থান বুঝতে ভুল করা এবং শরীয়তের অন্যান্য ইলমের সাথে এর সম্পর্কচ্যুতি। অনেকে তাসাওউফকে ভাবেন হাকীকত, আর এভাবে তারা তাসাওউফকে শরীয়ত থেকে আলাদা কিছু ভেবে বসে থাকেন। মনে হয় যেন কেবল তাসাওউফপন্থীরাই হাকীকত বা মূলমর্মান্বেষী, আর বাকীরা সব শরীয়ত অর্থাৎ, বাহ্যিকতাপন্থী। আসলে এটা ঠিক নয়। তাসাওউফ শরীয়তেরই একটি অংশ,[২] অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শরীয়ত সমগ্রভাবে ব্যাপক ও বিস্তৃত। কেউ কেউ

[১] "দীন-দুনিয়ার এমন কোন বিষয় নেই যার মাঝে প্রতারণা, মিথ্যা ও জালিয়াতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়নি। কেউ মিথ্যা নবুওয়তের দাবী করেছে, অনেকে তা মেনেও নিয়েছে। মুশরেকরা ভ্রান্ত উপাস্য পর্যন্ত বানিয়েছে। যিন্দীক-মুলহিদরা জাল হাদীস বানিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নামে চালিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা করেছে। তথাকথিত প্রগতিবাদীরা এক ভ্রান্ত আইন তৈরী করে তাকে শরীয়তের অংশ বানাবার ভ্রান্ত চেষ্টা করতেও দ্বিধা করেনি। এসব প্রতারণা ও মিথ্যা জালিয়াতির পরও কোন কিছুর মূলতত্ত্ব ও বাস্তবতাকে অস্বীকার করা যায়? অবশ্যই নয়। বরং ভ্রান্ত ও ভেজালকেই বাদ দেওয়া হয়, খণ্ডন করা হয়।" মাওলানা আবদুল মালেক, তাসাওউফ তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ, পৃঃ ৫৩-৫৪

[২] "তাসাওউফের মূল হলো ইহসান। ইহসানকে রাসুলুল্লাহ ﷺ এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, "(তা হলো) এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করো যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ, কমপক্ষে এতটুকু অনুভূতি রাখো যে, তিনি তোমাকে প্রত্যক্ষ করছেন।.....অতঃপর বলা যায় যে, তাসাওউফ দীনেরই একটি শাখা,

শরীয়ত ও ফিকহকে সমার্থক বলে ভাবেন। আসলে ফিকহ পারিভাষিকভাবে দীন বা শরীয়তের একটি অংশ মাত্র, একমাত্র অংশ নয়। একইভাবে তাসাওউফ বা তাযকিয়া অর্থাৎ, আত্মশুদ্ধি–সমগ্র শরীয়তের একটি অংশ, গোটা দীন নয়। আর এ কারণেই তাসাওউফ শরীয়তের অন্যান্য ইলমের সাথে পরস্পর সম্পর্কিত। এভাবে যখন তাসাওউফকে বোঝা হবে তখন অনেক প্রকার ভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকা[১] এবং প্রকৃত তাসাওউফের সাথে জুড়ে থাকা অনেক সহজ হয়ে যাবে।

যা জিবরাঈল আলাইহিস সালাম সাহাবীদেরকে শিখিয়েছিলেন।" ইমাম আহমাদ যাররুক, কাওয়াঈদুত তাসাওউফ, পৃঃ ২৬-২৭

[১] প্রশংসাকারী ও সমালোচনাকারীদের দুই প্রান্তিকতার মাঝে তাসাওউফ আটকে রয়েছে। এক্ষেত্রে শায়খ ড. ইউসুফ আল কারযাবীর আলোচনা নিয়ে আসা খুবই প্রাসঙ্গিক হবে। তিনি বলেছেন,

"ইনসাফের কথা হচ্ছে, তাসাওউফের মূল ইসলামের মাঝেই রয়েছে, যা অনস্বীকার্য। এর মাঝে ইসলামের উপাদানই রয়েছে যা সুস্পষ্ট। এর দৃষ্টান্ত আমরা দেখি কুরআনে, সুন্নাহয়, রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সীরাতে, উমার, আলী, আবু দারদা, সালমান ফারসী ও আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহুম-এর মত সাহাবীদের জীবনীতে। যে ব্যক্তি কুরআন-হাদীছ অধ্যয়ন করবে সে দেখবে তা বারংবার দুনিয়ার জীবন ও নানা উপভোগ সামগ্রীর ফিতনার ব্যাপারে সাবধান করছে এবং নিজেকে আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি মনোনিবেশ করার দিকে আহ্বান জানাচ্ছে। জান্নাত, এর নিআমত, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর দীদার লাভের প্রতি উৎসাহিত করছে এবং জাহান্নামের শাস্তির ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করছে। হাদীছে আমরা বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা ও আল্লাহর প্রতি বান্দার ভালোবাসার বর্ণনা পাই। একইভাবে যুহদ, তাওয়াক্কুল, তাওবা, শোকর, সবর, ইয়াকীন, তাকওয়া, মুরাকাবাহসহ এ ধরণের অনেক কিছুর প্রতি উৎসাহব্যাঞ্জক কুরআনের আয়াত ও রাসূলের হাদীছ পাই। এগুলোর ব্যাখ্যা, কারণ বর্ণনা, প্রকারভেদ, ফযীলত বর্ণনা সূফী ছাড়া অন্যদের মাঝে তেমন একটা পাওয়া যায় না। উম্মাতের মাঝে তারাই নফসের দোষত্রুটি, অন্তরের রোগব্যাধি, শয়তানের কৌশল সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত। কত পাপী তাদের হাতে তাওবা করেছে, কত কাফির তাদের মাধ্যমে ইসলামে প্রবেশ করেছে! তবে তাসাওউফ প্রথম যুগের মত অবস্থায় স্থির থাকেনি। প্রথম যুগে তাসাওউফ ছিলো উত্তম চরিত্র ও আচার-আচরণ এবং ইখলাসের সাথে ইবাদাত শেখার মাধ্যম। ধীরে ধীরে তা পরিণত হলো অন্তর পরিশুদ্ধির মাধ্যমে মা'রিফাত, কাশফ ও ফয়যে ইলাহী প্রাপ্তির মাধ্যম। এভাবেই তাসাওউফে প্রবেশ করলো নানাবিধ বিকৃতি। এ বিকৃতিগুলো হলো–

ক. ব্যক্তিগত রুচি ও ভাবাবেগ তথা ইলহামকে ভালো-মন্দ ও সত্য-মিথ্যা জানার মানদণ্ড বানিয়ে নেওয়া। কেউ কেউ তো আলিমদের রাসূলের পক্ষ থেকে হাদীছ বর্ণনার বিপরীতে এমনও বলেছে যে, 'আমাকে আমার অন্তর তাঁর রব থেকে বর্ণনা করেছে!"

আমরা তাসাওউফ বা তাযকিয়ার ক্ষেত্রে তাকেই যোগ্য শিক্ষক বলে মনে করি– শরীয়ত ও হাকীকত, ফিকহ ও তাসাওউফ, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় দিকেই যার সমান স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ বিচরণ রয়েছে। যিনি হাকীকত খুঁজতে যেয়ে শরীয়ত থেকে নিজে যেমন বিমুখ হন না এবং অন্যকেও তেমনি বিমুখ করেন না। আবার ফিকহ ও আইনশাস্ত্রীয় জটিলতার মাঝে নিমজ্জিত থেকে যিনি চারিত্রিক পরিশুদ্ধি ও হাকীকত

খ. শরীয়ত ও হাকীকতকে পৃথক করে ফেলা। সূফীদের অতিরঞ্জনের ক্ষেত্রে বলা হত, 'শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে তারা সমালোচনার যোগ্য, কিন্তু হাকীকতের দিক থেকে দেখলে তারা মাজুর বা একান্ত নিরুপায়!'

গ. দুনিয়াকে পরিপূর্ণ অবহেলা ও পরিত্যাগ করা, যা কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবীদের সামষ্টিক শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক

ঘ. তাদের মাঝে ও তাদের মাধ্যমে সাধারণের মাঝে জাবরিয়া আকীদা ও নেতিবাচক মনোভাবের প্রসার। তাদের কথাবার্তা থেকে মনে হয় মানুষ স্বাধীন ও ইখতিয়াসম্পন্ন কোনো সৃষ্টি নয়, বরং সে আল্লাহর তাকদীরের কাছে নিষ্প্রাণ পুতুল সমতুল্য। এ কারণে তারা বলত দুনিয়ার জীবনের বিশৃঙ্খলা ও ফিতনার মোকাবিলা কিংবা বাতিলের সাথে সংঘর্ষ করে কোনো লাভ নেই, আল্লাহ যেভাবে চেয়েছেন সেভাবেই তাঁর বান্দাদেরকে চালাচ্ছেন!

ঙ. শায়খের কাছে মুরীদের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিসর্জন। তারা বলত, 'মুরীদ নিজেকে শায়খের কাছে পরিপূর্ণ সঁপে দেবে, যেভাবে মৃত ব্যক্তি গোসল দেওয়া ব্যক্তির হাতে নিজেকে সঁপে দেয়'। তারা এও বলত, যে মুরীদ শায়খের সামনে জিজ্ঞেস করে, 'কেন?' সে কখনোই সফল হতে পারবে না।

সূফীদের ব্যাপারে সবচেয়ে ইনসাফপূর্ণ কথা বলেছেন ইবনু তাইমিয়্যাহ। তিনি বলেছেন, মানুষ তাদের (সূফীদের) ব্যাপারে পরস্পর দ্বৈততায় লিপ্ত রয়েছে। একদল তাসাওউফ ও সূফীদের সমালোচনা করে, তাদেরকে বিদআতী ও সুন্নাহবহির্ভূত বলে মনে করে। এক্ষেত্রে তারা ফিকহ ও কালামবিদদের থেকে উক্তি নকল করে থাকে। আবার আরেকদল সূফীদেরকে আম্বিয়াদের পরে সর্বশ্রেষ্ঠ ও পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি বলে দাবী করে। সঠিক কথা হচ্ছে, আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে তারা মুজতাহিদদের মত। অন্যরা যেভাবে ইজতিহাদ করেছে তেমনি তারাও করেছে। তাদের মাঝেও একদল আছে যারা তাদের ইজতিহাদের দিক থেকে নৈকট্যবর্তী ও অগ্রবর্তী এবং কেউ কেউ আছে যারা মধ্যপন্থী, তারাই আহলুল ইয়ামিন। প্রত্যেক দলের মাঝেই এমন ব্যক্তি আছে যারা তাদের ইজতিহাদে ভুল করেছেন। তেমনি তাদের মাঝে এমন লোকেরাও আছে যারা পাপী, তাওবা করুক বা না করুক। সূফীদের দিকে সম্বোধিতদের এমন লোকও আছে যারা নিজেদের আত্মার প্রতি যুলুমকারী এবং নিজ রবের প্রতি পাপাচারী। (ড. ইউসুফ আল কারযাবী, ফাতাওয়া মুআছিরা, ১/৭৪১-৭৪৩ থেকে সংক্ষেপিত)

অন্বেষা ও উপলব্ধির দ্বারকেও বন্ধ করে রাখেন না। যিনি সকল কিছুকে পরিমিতির সাথে গ্রহণ করেন এবং একইভাবে অপরকেও শিক্ষা দেন।

আর এ কারণে আমরা আমাদের এই যাত্রায় আমাদের শিক্ষক হিসেবে বেছে নিয়েছি ইমাম ইবনু আতাঈল্লাহ আল-ইসকান্দারীকে। যিনি আধ্যাত্মিকতা, ফিকহ, হাদীছ ও আরবী ব্যাকরণের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ বলে সুবিদিত। ইবনু আতাঈল্লাহর লিখিত কিতাবাদির মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ 'আল-হিকাম'। 'হিকাম' শব্দটি 'হিকমাহ'-এর বহুবচন। যার অর্থ দাঁড়ায় প্রজ্ঞাপূর্ণ বচনসমূহ। বইটি ২৬৪টি ছোট ছোট প্রজ্ঞাপূর্ণ কথার সমাহার। ছোট হলেও তা আসলে সত্যের পথিকদের জন্য অনন্য দিকনির্দেশনার মত, যা ধাপে ধাপে পথিককে পথ দেখিয়ে যায়। এ বইটি মূলত সেই বইটি থেকেই অনুপ্রাণিত। আল-হিকামের কিছু বচনকেই আমরা আল্লাহর পথের যাত্রার পাথেয় হিসেবে দেখার ও দেখানোর চেষ্টা করেছি।

এই যাত্রার প্রারম্ভ হয় তাওবা, আল্লাহর প্রতি আশা, ইখলাস-একনিষ্ঠতা, তাওয়াক্কুল-আল্লাহ নির্ভরতা, তাঁর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তাভাবনা ও নিজের দোষত্রুটি অন্বেষণ দিয়ে এবং এর সমাপ্তি ঘটে আল্লাহ সচেতনতা, বিনয়, আল্লাহর সিদ্ধান্তের ব্যাপারে পরিতুষ্টি ও সকল কাজে ইহসান বা সর্বাধিক উৎকর্ষতার মাধ্যমে, যেই ইহসান মুমিনের পরম কাঙ্ক্ষিত, যে ব্যাপারে নবী ﷺ বলেছেন, "তা হলো এমনভাবে ইবাদাত করা যে তুমি আল্লাহকে দেখছ, কমপক্ষে এতটুকু অন্তরে জাগরুক রাখা যে, তিনি তোমাকে অবশ্যই দেখছেন।"[১]

ইমাম ইবনু আতাঈল্লাহ (যার আভিধানিক অর্থ 'আল্লাহর দান বা উপহার') তাঁর নামকে নিজ জীবনের মাধ্যমে সঠিক প্রমাণিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আল্লাহ তাঁকে ইলম ও হিকমাহর ভাণ্ডার থেকে প্রভূত পরিমাণে দান করেছিলেন। এই হিকমাহ নিজে যেমন কল্যাণময়, তেমনি যাকে তা দেওয়া হয় তাকেও তা প্রভূত কল্যাণের পথই দেখায়।

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَّشَآءُ ۚ وَمَن يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

"তিনি যাকে ইচ্ছা প্রজ্ঞা দান করেন এবং যাকে প্রজ্ঞা দান করা হয়, সে প্রভূত কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়।"[২]

---

[১] বুখারী

[২] সূরা বাকারাহ, ২:২৬৯

তাসাওউফ শাস্ত্রের বিশিষ্ট পণ্ডিত হিসেবে অধিক প্রসিদ্ধ হলেও তিনি একইসাথে মালিকী মাযহাবের প্রখ্যাত ফকীহও ছিলেন। হাদীছ ও ফিকহ ছাড়া কারো পক্ষে তাসাওউফ শাস্ত্রে প্রাজ্ঞতা অর্জন করা সম্ভব নয়।[১]

তাসাওউফের পথিকের জন্য কোনো হালালকে হারাম কিংবা হারামকে হালাল জ্ঞান করার কিংবা ফতোয়া দেওয়ার অনুমতি নেই। আর হালাল-হারামের জ্ঞানের জন্য প্রয়োজন ফিকহ ও হাদীছের বিশদ জ্ঞান। ইবনু আতাঈল্লাহর সমসাময়িকরা তাসাওউফ ও ফিকহ-ফতোয়া উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর পারঙ্গমতার সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি ৬৪৭ হিজরী/১২৫০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মিসরের আলেক্‌জান্দ্রিয়ায় তিনি বেড়ে ওঠেন। সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন ৭০৯ হিজরী/১৩০৯ খ্রিস্টাব্দে। রেখে যান বহুসংখ্যক ছাত্র ও উপকারী রচনা। আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন ও জান্নাতে উঁচু মাকাম দেন, এই প্রার্থনা থাকলো।

---

[১] ইমাম মালিক থেকে বর্ণিত আছে, "যে তাসাওউফ চর্চা করলো, কিন্তু ফিকহ চর্চা করলো না সে যিন্দীক হয়ে গেলো। যে ফিকহ চর্চা করে, কিন্তু তাসাওউফ চর্চা করলো না সে ফাসিক হয়ে গেলো। যে এ দুইয়ের মাঝে সমন্বয় করলো সে-ই যথার্থ কাজ করলো।" ইমাম আহমাদ যাররুক, কাওয়াঈদুত তাসাওউফ, পৃঃ ২৫

ইবনু আতাঈল্লাহ ইসকান্দারী বলেছেন, "যেই উপকারী ইলম আল্লাহর আনুগত্যের সাথে জড়িত, যার মাধ্যমে আল্লাহভীতি প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়, আল্লাহপ্রদত্ত সীমার মাঝে অবস্থান করা যায় তা হলো– আল্লাহর মা'রিফাতের জ্ঞান। তবে যে তাওহীদের ক্ষেত্রে শিথিলতা দেখায়, শরীয়তের বাহ্যিক বিধানের আবশ্যকতা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেয় সে নিজেকে যানদাকাহর সমুদ্রে নিক্ষেপ করে।" ইমাম ইবনু আতাঈল্লাহ আল-ইসকান্দারী, তাজুল উরুস"

আহমাদ যাররুক বলেছেন, "ফিকহ ছাড়া কোনো তাসাওউফ নেই, কেননা ফিকহ ছাড়া আল্লাহর বিধান জানা সম্ভব নয়। তাসাওউফ ব্যতিরেকে কোনো ফিকহ নেই, কেননা তাসাওউফ ছাড়া সঠিক অভিমুখ অর্জন করা সম্ভব নয়। আর ঈমান ছাড়া ফিকহ বা তাসাওউফ কোনোটাই সম্ভব নয়। কেননা ঈমান ছাড়া ফিকহ ও তাসাওউফের কোনোটিই যথার্থ নয়। এদের মাঝে যথাযথ সমন্বয় জরুরী, যেভাবে আত্মা ও শরীরের মাঝে যুৎসই অন্বয় দরকারী।" ইমাম আহমাদ যাররুক, কাওয়াঈদুত তাসাওউফ, পৃঃ ২৫

প্রথম পদক্ষেপঃ তাওবা ও আশা

"কোনো ভুল করে বসলে যদি আল্লাহর ব্যাপারে তোমার আশা কমে যেতে দেখো, তবে জানবে যে তুমি আসলে তোমার নিজের কর্মের ওপর নির্ভর করছ আল্লাহর রহমতের ওপর নয়।"

আল্লাহর দিকে আধ্যাত্মিক যাত্রায় প্রথমেই প্রশ্ন আসে–কোথা থেকে শুরু করবো? এই যাত্রায় আমার সঙ্গী কি হবে? আমি কি নিজ ভালো আমলকে স্মরণ করবো এবং তাদেরকেই যাত্রার পাথেয় হিসেবে নেবো? ইবনু আতা বলছেন, না, নিজের সৎকর্মের ওপর নির্ভর কোরো না। আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করো। কেবলমাত্র তাঁর ওপর নির্ভর করে এবং তাঁর রহমত ও দয়ার আশা করে তোমাকে যাত্রা শুরু করতে হবে।

প্রশ্ন আসতে পারে–ভালো আমলই কি আল্লাহর রহমত পাওয়ার কারণ নয়? ভালো আমল না করা হলে কি আল্লাহর রহমত বর্ষণ বন্ধ হয়ে যায় না? আল্লাহ বলছেন,

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةٍ

> "যদি আল্লাহ লোকদেরকে তাদের অন্যায় কাজের কারণে পাকড়াও করতেন, তবে ভুপৃষ্ঠে চলমান কোনো কিছুকেই ছাড়তেন না।"[১]

মানুষের মধ্যে প্রত্যাবর্তন তথা ফিরে আসার যে প্রবণতা স্বাভাবিকভাবেই লুকিয়ে রয়েছে তা তখনই কার্যকর হয়, যখন তার কাছে বর্তমান জীবনের গতিবিধির চূড়ান্ত পরিণতির হাস্যকরতা এবং নিষ্ফলতা তার নিজের কাছে ধরা পড়ে। নিজের বর্তমান অবস্থার প্রতি অসন্তুষ্টি, গুনাহের প্রতি তীব্র আফসোস ও অনুতাপ এবং নিজেকে শুধরে নেওয়ার প্রবল প্রতিজ্ঞাই মূলত তাওবার মূল মর্ম। অন্তরের আন্তরিক এই উপলব্ধিই মূলত তাওবা। নিজের ভুলত্রুটির 'গোমর ফাঁস' হয়ে যাওয়ার এই অবস্থাই মূলত তাওবার দিকে ধাবিত করে।

[১] সূরা নাহল : ৬১

মূল ব্যাপার আল্লাহর রহমতের 'যোগ্য' হওয়া কিংবা আল্লাহর রহমত 'প্রাপ্ত' হওয়া নয়। মূল বিষয় হচ্ছে নিজের ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও আল্লাহর রহমত ও ঐশ্বর্যের ওপর নির্ভর করতে পারা। সঠিক পথের দিকে এটাই যথার্থ প্রারম্ভ।

তবে আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশা করতে হলে অবশ্যই নিজ ভুলত্রুটির জন্য তাওবা করতে হবে। আল্লাহর চিরন্তন সুন্নাত মোতাবেক কোনো কিছুকে নির্দিষ্ট স্থানে রাখতে হলে তার জন্য স্থান বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। ঈমানও এই সুন্নাতের ব্যতিক্রম নয়। অন্তরকে ঈমান, নূর ও আল্লাহর স্মরণ দ্বারা পরিপূর্ণ করতে হলে আমাদের অন্তরকে অবশ্যই এমন অবস্থানে নিয়ে আসতে হবে যা অন্য কোনো বিষয় কিংবা বাসনা দ্বারা পূর্ণ হবে না। তখনই আমরা আমাদের অন্তরকে সুকৃতি দ্বারা সজ্জিত করতে পারবো। সূফীদের পরিভাষায় একে বলা হয় 'তাখাল্লি ছুম্মাত তাহাল্লি ছুম্মাত তাজাল্লি' অর্থাৎ, প্রথমে অন্তরকে সকল দুষ্কৃতি, কামনা-বাসনার ইচ্ছা থেকে মুক্ত করতে হবে; এরপর নিরন্তর উত্তম আমল করে একে সজ্জিত করতে হবে এবং এরপরেই আত্মিক-আধ্যাত্মিক আলোর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

ইবনু আতার মতে তাওবার সাথে সাথে আল্লাহর ওপর আশাও করতে হবে। কিন্তু তাওবার সাথে আশার কি সম্পর্ক? কেনই-বা তা জরুরী? আল্লাহর পথে যাত্রার সাথে তা কতটুকু সম্পর্কিত? ইবনু আতা বলছেন,

"কোনো ভুল করে বসলে যদি আল্লাহর ব্যাপারে তোমার আশা কমে যেতে দেখো, তবে জানবে যে তুমি আসলে তোমার নিজের কর্মের ওপর নির্ভর করছ আল্লাহর রহমতের ওপর নয়।" আল্লাহর দয়ার প্রত্যাশা করা ও তাঁর ওপর ভরসা করার অর্থ হচ্ছে আপনি নিজ চেষ্টা ও আমলের মাধ্যমে পুণ্য হাসিল করতে পারেন না। আল্লাহর চাইতে নিজ আমলের ওপর ভরসা করার একটি নিদর্শন হচ্ছে গুনাহ বা ভুল করে বসলে অন্তর হতাশ হয়ে যায়, আল্লাহর রহমতের ওপর আশা হ্রাস পায়, কেননা,ম আল্লাহর দয়ার ওপর নির্ভর করার অর্থ হচ্ছে সবসময় আল্লাহর দয়ার প্রত্যাশা করা, ভালো ও খারাপ অবস্থায়, সুখে ও দুঃখে, গুনাহ হয়ে গেলে এবং গুনাহ না হলেও, সর্বাবস্থায় আল্লাহর কাছে প্রত্যাশার স্তর একই থাকা।

আলিমগণ যথার্থ তাওবার জন্য চারটি শর্ত বাতলেছেন,

- এক. নিজের ভুলের ব্যাপারে আফসোস ও অনুতপ্ত বোধ করা
- দুই. যদি তা চলমান কোনো গুনাহ হয়ে থাকে তবে তা থেকে বিরত থাকা
- তিন. ভবিষ্যতে সেই গুনাহ পুনরাবৃত্তি না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা এবং

- চার. যদি সেই গুনাহর সম্পর্ক মানুষের অধিকার লঙ্ঘনের সাথে হয়ে থাকে তবে মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে।

যথার্থ তাওবার জন্য এই চারটি শর্ত অবশ্যই পূরণ করতে হবে।
প্রথম শর্ত হচ্ছে, অনুতপ্ত হওয়া। নবী ﷺ বলেছেন

النَدم تَوبة

"অনুতপ্ত হওয়াই তাওবা।"[১]

দ্বিতীয় শর্ত, গুনাহ থেকে বিরত হওয়া। গুনাহের পুনরাবৃত্তি করতেই থাকা সাথে সাথে তাওবার দাবী করা নিফাক, এমনটা করা বৈধ নয়।

তৃতীয় শর্ত, গুনাহ পুনরায় না করার দৃঢ় ইচ্ছা রাখা। এমনটা সম্ভব নয় যে, কেউ গুনাহের ব্যাপারে অনুতপ্ত হবে, তারপর তা থেকে বিরত থাকবে এবং সাথে সাথে গুনাহ পুনরায় করার ইচ্ছাও পুষে রাখবে। এটা অযৌক্তিক। আর এমনটা যদি হয়েই যায় তবে সমাধান হচ্ছে পুনরায় তাওবা করে নেওয়া। তাওবা নবায়ন করে নেওয়া। এই একই প্রক্রিয়ার পুনরাবর্তন করা। আবার অনুতপ্ত হওয়া, আবারও এই শপথ করা যে পুনরায় এই গুনাহ করবো না। আল্লাহ অবশ্যই সর্বাধিক ক্ষমাশীল। আল্লাহ বারংবার নিষ্ঠাপূর্ণ তাওবা গ্রহণ করেন। বরং তিনি বান্দার তাওবায় সন্তুষ্ট হন, যেমনটা নবী ﷺ বলেছেন।

চতুর্থ শর্ত, আলিমগণ বলেছেন যদি কারো গুনাহ বান্দার হকের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয় তবে তাকে অবশ্যই তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, যেমন–যদি কেউ কারো মালিকানার জিনিস অন্যায়ভাবে কেড়ে নেয় তবে তাকে সেই জিনিস অবশ্যই ফিরিয়ে দিতে হবে। কারো ওপর অবিচার করলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আলিমরা এও বলেছেন যে, যদি কেউ মানুষের ব্যাপারে ভালো-মন্দ বলে তাকেও মাফ চেয়ে নিতে হবে, যদি সত্যিকারার্থে তাওবা করতে হয় তো।

ইবনু আতা ধরে নিচ্ছেন এই শর্তগুলো পূরণ করা হয়েছে, এরপর তিনি আল্লাহর ওপর আশা রাখতে বলেছেন, তবে এটা তাওবার শর্ত নয়, আল্লাহর সাথে আদব। কেননা, আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশা করা নেককারদের বৈশিষ্ট্য।

[১] ইবনু মাজাহ ও ইবনু হিব্বান

أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

"তারা আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী। আর আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাকারী করুণাময়।"[১]

কখনো কখনো হতাশা চলে আসতে পারে এই ভেবে যে, আমি তো এত গুনাহ করেছি আল্লাহ কি মাফ করবেন? তিনি কীভাবে আমার তাওবা কবুল করতে পারেন? এরকমটা ভাবাটাই ভুল। আমরা আল্লাহকে পরম করুণাময় বলে বিশ্বাস করি, তারপরেও তিনি আমার গুনাহ ক্ষমা করতে পারেন না বা করবেন না—এমন বিশ্বাস করাটাই ভুল।

قَالَ وَمَن يَّقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّآلُّونَ.

"তিনি বললেন, পালনকর্তার রহমত থেকে পথভ্রষ্টরা ছাড়া আর কে নিরাশ হয়?"[২]

আর যে আল্লাহর ওপর থেকে আশা-প্রত্যাশা হারিয়ে ফেলে সে আসলে আল্লাহর ওপর নয়, নিজের দুর্বল সত্তা, সীমাবদ্ধ মন ও ক্ষীণ আমলের ওপর নির্ভর করছে। তার মানে এই নয় যে, ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে নিষ্ক্রিয় হয়ে কাজকর্ম বন্ধ করে দেবে। বরং এর মানে হচ্ছে অন্তরে আল্লাহর ওপর নির্ভরতা থাকবে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিজ কর্ম করে যাবে।

মানুষের গুনাহ যত বড়ই হোক না কেন সর্বদা আল্লাহর প্রতি উত্তম ধারণা রাখা চাই। কেউ যদি একনিষ্ঠতার সাথে তাওবা করে তবে প্রবল আশা এই যে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করে নেবেন। নবী ﷺ বলেছেন,

اَلتَّائِبُ مِنْ الذَنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

"গুনাহ থেকে তাওবা করা ব্যক্তি এমন যেন সে কোনো গুনাহই করেনি।"[৩]

তিনি আরও বলেছেন,

---

[১] সূরা বাকারাহ :২১৮

[২] সূরা হিজর:৫৬

[৩] ইবনু মাজাহ

> "আল্লাহ বলেছেন, হে আদমসন্তান! যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমাকে ডাকবে ও আমার কাছে ক্ষমা চাইবে ততক্ষণ আমি তোমাকে ক্ষমা করবো, আমি কোনো পরোয়া করি না। হে মানবসকল! যদি তোমরা আমার কাছে পৃথিবী সমপরিমাণ গুনাহ নিয়েও আসো তবুও আমি তোমাদের ক্ষমা করবো, কোনো কিছুর পরোয়া করবো না।"[১]

এ কারণে গুনাহ যত গুরুতরই হোক না কেন তা যেন আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করতে না পারে; বরং উচিত আল্লাহর কাছে একনিষ্ঠভাবে প্রত্যাবর্তন করা, তাঁর দয়া প্রত্যাশা করা ও তাঁর রহমতের ওপর ভরসা করা। নবী ﷺ আরও বলেছেন,

يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ فَلْيَظُنَّ بِيْ مَا شَاءَ.

> "আল্লাহ বলেছেন, বান্দা আমাকে যেমনটা মনে করে আমি তার কাছে তেমনই, সে যেমনটা চায় আমার ব্যাপারে ভাবতে পারে (অর্থাৎ, সে চাইলে আমাকে দূরবর্তীও মনে করতে পারে আবার নিকটবর্তীও মনে করতে পারে।"[২]

বান্দার উচিত না যে সে আল্লাহর চাইতে নিজের আমলের ওপর অধিক নির্ভর করবে। কেননা রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لَنْ يُدْخِلَ الجَنَّةَ أَحَدًا عَمَلُهُ قَالُوْا: وَلَا أَنْتَ؟ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قالَ: وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ.

> "তোমাদের কেউই কেবলমাত্র নিজের আমল দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।" সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! এমনকি আপনিও না?" তিনি উত্তরে বললেন, "না, আমিও না, যতক্ষণ না আল্লাহ আমাকে তাঁর রহমতে আচ্ছাদিত করে নিচ্ছেন।"

এই হাদীছের মর্ম হলো আমরা নিজেদের আমল করে যাবো তবে ভরসা আমলের ওপর নয় বরং আল্লাহর ওপর করবো। ইবনু আতা এমনটাই বলতে চাচ্ছেন।

---

[১] (তিরমিযী)

[২] বুখারী ও মুসলিম।

তবে আল্লাহর ওপর ভরসা করা যেন আবার নিজেকে নিরাপদ ভাবতে প্ররোচিত না করে। নিজেকে আল্লাহর শাস্তি থেকে মুক্ত মনে করা কখনোই কাম্য নয়।

وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّآ أَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً

"তারা বলে, আগুন আমাদেরকে কখনোই স্পর্শ করবে না; অল্প কয়েকটা দিন বাদে।"[১]

এই আয়াত পূর্ববর্তী জাতিদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছিলো। তারা নিজেদেরকে স্রষ্টার নির্বাচিত বিশেষ বান্দা বলে ভাবত। তারা দুনিয়াতে যা খুশি তা-ই করুক না কেন এতে তাদের বিশেষত্বে কোনো প্রভাব পড়তে পারে না, এমনটাই ছিলো তাদের বিশ্বাস। আজকাল কিছু মুসলিমও এমন বিশ্বাস করে যে, তারা যা খুশি করুক না কেন তা তাদের কোনো সমস্যা নেই, কেননা তারা তো মুসলিম, একদিন না একদিন জান্নাতে তো তারা যাবেই!

فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ.

"বস্তুতঃ আল্লাহর পাকড়াও থেকে তারাই নিশ্চিন্ত হতে পারে, যাদের ধ্বংস ঘনিয়ে আসে।"[২]

আল্লাহর প্রতি আশা যাতে কখনোই এই নিশ্চয়তায় ভোগাতে না পারে যে, আল্লাহ অবশ্যই আমাদের ওপর দয়া করবেন, আমরা যা খুশি তা-ই করি না কেন। জান্নাতে ঢোকার আগ পর্যন্ত মুমিন নিশ্চিত হতে পারে না। আবু বকর সিদ্দিক রাদিআল্লাহু আনহু বলেছেন, "আমার এক পা জান্নাতে আর আরেক পা জান্নাতের বাহিরে থাকলেও আমি আল্লাহর (শাস্তির আশঙ্কা) থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করি না।"

আশা ও ভয়ের মাঝে পরিমিতিবোধ থাকা প্রয়োজন। আসলে পরিমিতিবোধ এমন এক চিরন্তন মূলনীতি প্রত্যেকটি বিষয়েই যার প্রতি খেয়াল রাখা উচিত। গোটা ইসলামই সুষমতা ও পরিমিতিবোধের অনন্য নিদর্শন। ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস, আইন, নৈতিক নিয়মনীতি ও বিধিবিধান আমাদেরকে এই পরিমিতিবোধ ও ভারসাম্যই শিক্ষা দেয়। তাওবার ক্ষেত্রেও ভারসাম্য বজায় রাখা একান্ত জরুরী, যাতে

[১] সূরা বাকারাহ :৮০
[২] সূরা আ'রাফ :৯৯

আমরা কেবলমাত্র আল্লাহর দয়ার ওপর ভরসাই নয় সাথে সাথে আল্লাহর শাস্তির ভয়কেও মাথায় রাখি।

কারো কারো মাঝে নৈরাশ্যের প্রাবল্য দেখা যায়। তারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে তো চায় কিন্তু ভাবে আল্লাহ বোধহয় তাদেরকে কখনোই মাফ করবেন না। অতএব তারা নিজেদের অবস্থাতেই গুমরে পড়ে থাকে। আল্লাহ বলছেন,

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۙ أَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوْٓءًا بِجَهٰلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهٖ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ.

> "তোমাদের রব তাঁর নিজের উপর লিখে নিয়েছেন দয়া, নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্য থেকে যে না জেনে খারাপ কাজ করে তারপর তাওবা করে এবং শুধরে নেয়, তবে তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর এভাবেই আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি। আর যাতে অপরাধীদের পথ স্পষ্ট হয়ে যায়।"[১]

এক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেকের উচিত আল্লাহর দয়ার প্রতি আশা রাখা, তাঁর শাস্তিকে ভয় করা এবং নিজের অন্তরকে তার দিকে প্রত্যাবর্তন করানো। এটাই আল্লাহর দিকে যাত্রার প্রথম ঘাঁটি।

[১] সূরা আনআম :৫৪-৫৫

দ্বিতীয় পদক্ষেপঃ আল্লাহর সুন্নাতের খেয়াল রাখা

"একজন মানুষ, তার ইচ্ছাশক্তি যতই শক্তিশালী হোক না কেন, সে কখনোই ভাগ্যের দেয়াল ভেদ করতে পারবে না।"

নিজেদের অজস্র গুনাহ সত্ত্বেও আমরা আল্লাহর প্রতি ভরসা রেখে এই যাত্রা শুরু করেছি। আমরা যেন কখনোই নিজেদের ত্রুটিবিচ্যুতির কারণে আল্লাহর দয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে না নেই। আল্লাহ ক্ষমাশীল। যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা একনিষ্ঠ তাওবা করবে আল্লাহ ততক্ষণ তাকে মাফ করবেন।

যাত্রার প্রথমদিকে আমাদের মনোবল দৃঢ় থাকে, উদ্যম থাকে পরিপূর্ণ। সে চেষ্টা করে নিজেকে, নিজের পরিবার ও সমাজকে, রাষ্ট্রকে এমনকি গোটা বিশ্বকে রাতারাতি পরিবর্তন করে ফেলতে। ইবনু আতা বলছেন, "একজন মানুষ, তার ইচ্ছাশক্তি যতই শক্তিশালী হোক না কেন, সে কখনোই ভাগ্যের দেয়াল ভেদ করতে পারবে না।" অর্থাৎ, মানুষ কখনোই আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্যকে অতিক্রম করতে পারবে না, তাকে ডিঙ্গিয়ে কোনো কাজ করতে পারবে না। আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্য বা তাকদীরের মধ্যে তাঁর সুন্নাতসমূহও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি নিজেই বলেছেন,

فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبْدِيْلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَحْوِيْلًا.

"তুমি আল্লাহর সুন্নাতের মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখতে পাবে না। তুমি আল্লাহর সুন্নাতের কোনো ব্যতিক্রম দেখতে পাবে না।"[১]

গোটা মহাবিশ্বই এভাবে সৃষ্টি হয়েছে,

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ

"নিশ্চয়ই আমি সব কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাণ অনুযায়ী।"[২]

---

[১] সূরা ফাতির :৪৩

[২] সূরা ক্বমার :৪৯